অভিসরণ / ABHISARON
A Multilingual International Peer-Reviewed Research Journal
Volume 1, Issue II, July 2026, PP. 234-240
www.abhisaron.com
ISSN-3139-4027(Online)
DOI - https://dx.doi.org/10.67757/abhisaron.2026.v1i2.033

RABINDRASAHITYE ABANGALI CHORITRA : LABORATORY CHOTOGAPLER SOHINI / রবীন্দ্রসাহিত্যে অবাঙালি চরিত্র : 'ল্যাবরেটরি' ছোটগল্পের সোহিনী

SUCHANDRA ROY / সুচন্দ্রা রায়
গবেষক, লেখক, প্রাবন্ধিক
তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
Email: suchandra.roy.1991@gmail.com

Accepted: 07.07.2026
Published: 20.07.2026

Keywords:
সোহিনী, ছোটগল্প, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চরিত্র সৃষ্টি ও সমালোচনা, ল্যাবরেটরি, তিনসঙ্গী, কথাসাহিত্য, অবাঙালি চরিত্র

Abstract:

রবীন্দ্রনাথ তাঁর গল্প ও উপন্যাসে মানবিক সম্পর্কের গভীরতা বোঝাতে বিভিন্ন প্রান্তের ও সংস্কৃতির চরিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। এই চরিত্রগুলি রবীন্দ্রসাহিত্যে এক ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছে। তাঁর সাহিত্যে অবাঙালি চরিত্রের উপস্থিতি অবশ্যই দেশ বা সংস্কৃতির ভেদরেখা পেরিয়ে মানুষের মনস্তত্ত্ব ও আত্মিক সম্পর্কের প্রতি বেশি গুরুত্বকে নির্দেশ করে। তাঁর 'তিনসঙ্গী' গল্পগ্রন্থের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও আধুনিক ছোটগল্প 'ল্যাবরেটরি'-র প্রধান চরিত্র সোহিনী। প্রথাগত সতীত্বের বাঁধন ভেঙে সে হয়ে উঠেছে বুদ্ধিমত্তা, আধুনিকতা ও বিজ্ঞানমনস্কতার এক অনন্য নজির। রবীন্দ্রনাথ তাঁর পরিণত বয়সে নারীর যে ক্ষমতায়ন ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় ফুটিয়ে তুলেছেন, তার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হল এই জন্মসূত্রে অবাঙালি চরিত্র সোহিনী। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কথাসাহিত্যে অবাঙালি চরিত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে অভারতীয় চরিত্রদের পাশাপাশি অনেক কাহিনিতে মূল চরিত্রের জায়গায় অনেক অবাঙালি ভারতীয়কেও বেছে নিয়েছেন। তেমনই একটি চরিত্র হল 'ল্যাবরেটরি' গল্পের সোহিনী। সমগ্র ভারত ও তার বাইরের মানুষের প্রতি রবীন্দ্রনাথের অসাম্প্রদায়িক ও মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি এই চরিত্রগুলোর মাধ্যমে ফুটে উঠেছে ঠিকই, তবে এছাড়াও আর বিশেষ কোনো সাহিত্যিক উদ্দেশ্য এই চরিত্রগুলির মাধ্যমে সাধন করার উদ্দেশ্যেই এই চরিত্রগুলি চরিত্রসৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রাধান্য পেয়েছে নাকি, বিশেষত 'ল্যাবরেটরি' গল্পের সোহিনী চরিত্রের ক্ষেত্রে তা বোঝার চেষ্টা করা হবে।

Discussion:

রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্যে অবাঙালি চরিত্রের উদাহরণ বিরল না হলেও সহজলভ্যও নয়। সমগ্র রবীন্দ্র- ছোটগল্পের ভাণ্ডারকে বিশ্লেষণ করলে সেটিকে কালের প্রেক্ষিতে মূলত চারটি ভাগে ভাগ করা যায়। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ অবধি বিস্তৃত সময়কালের মধ্যে তাঁর রচিত সমস্ত ছোটগল্পের শেষ গল্প হিসাবে ধরা হয় 'তিনসঙ্গী' গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত শেষ গল্প 'ল্যাবরেটরি' গল্পটিকে। ১৩৪৭ বঙ্গাব্দে শারদীয়া আনন্দবাজারে প্রকাশিত এই ছোটগল্পটি রবীন্দ্রনাথের একেবারে শেষজীবনের রচনা। এই গল্প অভূতপূর্ব অনেক কিছুর সাক্ষী, তবে তার মধ্যে অন্যতম হল জন্মসূত্রে পাঞ্জাবী সোহিনী নামক একজন নারীকে মূল চরিত্র হিসাবে চিত্রিতকরণ করা। রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য ছোটগল্পে অবাঙালি বা বিদেশি চরিত্রের উপস্থিতি থাকলেও তারা সোহিনীর মত ছকভাঙা নয়। উপন্যাসের অবাঙালি বা বিদেশি চরিত্রের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। অবাঙালি চরিত্রগুলিকে কোথাও তাদের দেশজ পরিচিতির বাইরে তাদের নিজস্ব তীব্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য নিয়ে উপস্থিত থাকতে সেভাবে দেখা যায়নি। সেটা 'কাবুলিওয়ালা' গল্পের রহমতই হোক, বা 'গোরা' উপন্যাসের গোরা, 'ঘরে-বাইরে'র মিসেস ডালটন, 'চার অধ্যায়'-এর ডক্টর স্যামুয়েল, অথবা 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পের মহারাজা ও মোগল রাজকুমারী; প্রত্যেকটি বিদেশি বা অবাঙালি চরিত্রের ক্ষেত্রে এতটা ছকভাঙার প্রয়াস তিনি করেননি, যতটা 'ল্যাবরেটরি' গল্পের পাঞ্জাবী চরিত্র সোহিনীর ক্ষেত্রে তিনি করার চেষ্টা করেছেন। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, 'গোরা' উপন্যাসের গোরা সামান্য স্বতন্ত্র, কারণ সে তার আসল পরিচয় না জেনে নিজেকে জন্মসূত্রে ভারতীয় বলেই মনে করতো। তাই তার আচরণ আইরিশ জাতিগত নয়।

সোহিনী চরিত্রটির মাধ্যমে ছকভাঙার যে যে প্রয়াস রবীন্দ্রনাথ করেছেন, তা হয়তো কালেরই চাহিদা বলে তিনি নিজেই মনে করেছেন। 'ল্যাবরেটরি' গল্পের মুখ্য চরিত্র হতে গেলে কেন একজন অবাঙালি নারীকেই প্রয়োজন হল সে প্রশ্ন এক্ষেত্রে উঠে আসে। বস্তুত, সোহিনী চরিত্রটি রবীন্দ্রনাথের পূর্বসৃষ্ট নারী চরিত্রদের থেকে এতটাই আলাদা যে এটি সহজে অনুমান করা যায় যে, তিনিও নিজের সৃষ্টির প্রামাণ্য উদাহরণের থেকে সরে এসে তাঁর সমসাময়িক কালের বাস্তবিক চিন্তাধারার সঙ্গে মানানসই আধুনিক একটি চরিত্র সৃষ্টির চেষ্টায় ছিলেন। তাঁর প্রথম পর্বের গল্প, অর্থাৎ, হিতবাদী পর্যায়ের গল্প থেকে বাংলা সাহিত্যের জগতে যে ঘরানার তিনি সৃষ্টি করেছিলেন, অর্থাৎ, বাংলা ছোটগল্পের ঘরানা, 'তিনসঙ্গী'র যুগ আসতে আসতে এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে সেই ঘরানা নানা পালাবদলের মধ্যে দিয়ে গেছে। তার উপর অন্যতম প্রভাব বিস্তার করেছিল কল্লোল সাহিত্য যুগ। এই সময় সম্পর্কে ভূদেব চৌধুরী বলেছেন, "প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর য়ুরোপীয় সমাজ ও সাহিত্যের পচনশীলতার ঢেউ লেগে আমাদের দেশেও কল্লোল-জীবনে ভাঙনের অন্তঃশক্তি প্রখরতম হয়ে উঠেছিল। তারপরে দ্বিতীয় যে বিশ্বযুদ্ধের প্রথম অভিঘাতই কেবল রবীন্দ্রনাথ অনুভব করে গেছেন, তার পরে বিশ্বজোড়া আণবিক সমাজ আজ এক অতলস্পর্শ শূন্য গহ্বরের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। সেখানে চরিত্রনীতি, দাম্পত্য, গার্হস্থ্য ইত্যাদি বিষয়ক মূল-চেতনার অন্তর্নিহিত পবিত্রতাবোধ সম্পূর্ণ তিরোহিত-প্রায়। এমন কি, সেকালে নারীপুরুষের অবাধ দৈহিক সম্পর্কে সন্তান-জন্মোত্তর প্রকাশ-সম্ভাবনাজনিত যে সামাজিক লজ্জাকরতার আশঙ্কা ছিল, আধুনিক কালের বিজ্ঞান তাকেও সম্পূর্ণ উন্মূলিত করেছে। ল্যাবরেটরি গল্প রচনার কালে বিদেশেও এসব সমস্যা অতটা প্রখর হয়ে হয়তো চোখে পড়েনি। কিন্তু, এই অনিশ্চয়তা-বোধের দুঃসম্ভাবনার সঞ্চয় সেদিনই জমতে শুরু করেছিল, এই সত্য আমাদের দেশে বসেও আজ আর অস্বীকার করবার উপায় নেই। আধুনিক সভ্যতার সে এক মস্ত সমস্যা।"[১] সম্ভবত কল্লোল যুগের আবহই রবীন্দ্রনাথকে চরিত্র নিয়ে নতুন করে ভাবিয়েছিল। পাশাপাশি তাঁর নিজের জীবনও একটি

পরিবর্তিত সময়কালের মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত হচ্ছিলো তা তিনি টের পেয়েছিলেন। 'গল্পগুচ্ছ' পর্বের বেশিরভাগ রচনাই যেখানে সহজ সরল গ্রাম্যজীবনের হাসিকান্না-প্রভাবিত; পরবর্তীকালে শহুরে জীবনযাপনের মধ্যে বাস করতে গিয়ে তিনি বুঝতে পারেন আধুনিকতার নামে যে প্রহসনকে শহুরে জীবনযাপনের মধ্যে বরণ করে নেওয়া হয়েছে তা আসলে অন্তঃসারশূন্য। ফলে তাঁর পরবর্তী রচনার প্রেরণা আর গ্রামজীবন থাকেনি, তিনি তাঁর সৃষ্ট চরিত্রদের যথেষ্ট আধুনিক করে তুলতে প্রয়াসী হন। নীহাররঞ্জন রায় এই আরোপিত আধুনিকতাকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, "সোহিনী আগাগোড়া জোর করিয়া যে শারীরিক ও মানসিক বেপরোয়া ভাবটা দেখাইয়াছে, 'মরা কাঠে কাঠঠোকরার ঠোকর' বলিয়া অধ্যাপক চৌধুরীর সঙ্গে যে ভাবে ব্যবহার করিয়াছে তাহা একান্তই জোর করিয়া আধুনিকতার বড়াই, আধুনিকতার ছদ্মবেশ। এ যেন লেখকের নিজের বুদ্ধি ও সংস্কারের সঙ্গে তথাকথিত আধুনিকতার লড়াই; জোর করিয়া সংস্কার ভাঙিবার চেষ্টা! ইহা যে একান্তই সজ্ঞান প্রয়াসগত তাহার প্রমাণ, গল্পের দিক হইতে এই প্রসঙ্গ অবান্তর, গল্পের পরিবেশের সঙ্গে এই প্রসঙ্গের কোনও যোগ নাই, সর্বোপরি প্রসঙ্গটির বস্তুমূল একান্তই শিথিল।"[২] 'ল্যাবরেটরি' গল্পের চরিত্রদের আধুনিক হয়ে ওঠার একান্ত প্রচেষ্টাকে লক্ষ্য করে নন্দকিশোর ও সোহিনী সম্পর্কে ভূদেব চৌধুরী বলেছেন, "ব্যক্তিত্বের তুঙ্গশিখরে একটি নারী এবং একটি পুরুষ উল্কার মত জ্বলছে এই গল্পের সর্বাঙ্গ জুড়ে,-- সে জ্বালা আধুনিকতার উদ্ভ্রান্তিতে অগ্নিদগ্ধ।"[৩] মূলত 'ল্যাবরেটরি' গল্পের সোহিনী তো বটেই, তাছাড়া সব চরিত্রদের মধ্যেই আধুনিকতার অহংকার গেঁথে দিতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এটা যে কল্লোল যুগের প্রভাব, তা অনুমানের অপেক্ষা রাখে না।

যথেষ্ট সময়োচিত সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণায় কল্লোলযুগের সাহিত্যের আধুনিকতার ও রিয়েলিজমের ধারণাকে গ্রহণ করলেও বিষণ্ণতাবোধ ও নৈরাশ্যকে তিনি গ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করেছিলেন। তাই সোহিনী চরিত্রের মধ্যে কিছু স্বাতন্ত্র্য রাখলেন তিনি। ফলে এই চরিত্রটিকে পুরোপুরিভাবে কল্লোল যুগের অনুসারী বলা চলে না, তা হয়ে থাকল একেবারেই রবীন্দ্রনাথের পৃথক সৃষ্টি। গল্পে সোহিনীকে বলতে দেখা যায়, "আমি সমাজের আইনকানুন ভাসিয়ে দিতে পারি দেহের টানে পড়ে, কিন্তু প্রাণ গেলেও বেইমানি করতে পারব না।"[৪] এই বেইমানি করতে না পারাটাই ছিল সোহিনী চরিত্রের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। অন্তঃসারশূন্য কোনো চরিত্র সৃষ্টি করার কথা রবীন্দ্রনাথ ভাবেননি কখনও। তাঁর সাহিত্য ভাণ্ডারের কোনো মূল চরিত্রের এরকম কোনো প্রতিফলন নেই। ভূদেব চৌধুরীর ভাষায়, "এই ইমানদারিতেই তো সোহিনীর নারীব্যক্তিত্বের চরম সতীত্ব,-- এক নূতন অর্থে।... এই ইমানদারিতেই নবযুগে নূতন সত্যের প্রতিষ্ঠা।"[৫] অর্থাৎ, সোহিনী চরিত্রটির মাধ্যমে সমাজে প্রচলিত সমস্ত প্রকার সতীধর্মের সংজ্ঞাকে ভেঙে খানখান করতে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। সে দেহধর্ম রক্ষা করতে চায় না, কিন্তু বেইমানি করতে পারবে না। অর্থাৎ, তার বেইমানির সংজ্ঞা ভিন্ন। তার সতীত্বের সংজ্ঞা ভিন্ন। এখানেই একটা উত্তর পাওয়া যায় যে, সোহিনী অবাঙালি কেন হল। কারণ রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত মনে করতেন, সতীধর্মের এই অভিনব সংজ্ঞা কোনো বাঙালি মেয়ের দ্বারা রক্ষা করা সম্ভব হবে না। তাই তিনি নতুনত্বের টানে চরিত্রের খোঁজ করলেন ভারতের পশ্চিম প্রান্তে।

সোহিনীর অদ্ভুত নারীচরিত্রই এ গল্পের কেন্দ্রগত আকর্ষণ। সে পাঠকের শ্রদ্ধা অর্জন করে তার একনিষ্ঠ নারীধর্মের কারণে। প্রচলিত অর্থে সে সতী নয়, কিন্তু বিগত স্বামীর সাধনাকে সে আপন করে নিয়ে নিজের মূল্য সপ্রমাণ করেছে। রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব যে তিনি বাংলা সাহিত্যকে সোহিনীর মত ব্রতী নারী চরিত্রকে উপহার দিয়েছেন। 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসের বিমলা নারীর নিজস্ব সত্তাকেই প্রকাশ করতে চেয়েছে; 'নষ্টনীড়', 'স্ত্রীরপত্র' প্রভৃতি ছোটগল্পও এই পরিপ্রেক্ষিতে স্মরণীয়। 'ল্যাবরেটরি' গল্পের সোহিনীকেও এই পরিমণ্ডলে রেখে বিচার করতে হবে। এই চরিত্র এক স্বাধীন তেজস্বিনী আত্মদীপ্ত নারী চরিত্র, যে নিজের সিদ্ধান্ত নিজেই নিতে পারে, সংসারে

পুরুষের অধীনে যার থাকার প্রয়োজন নেই, এবং কোনো পুরুষের মুখাপেক্ষীও সে নয়। সে নিজের সম্পর্কে বলেছে, "ছেলেবেলা থেকে ভালোমন্দ বোধ আমার স্পষ্ট ছিল না। কোনো গুরু আমায় তা শিক্ষা দেননি। তাই মন্দের মাঝে আমি ঝাঁপ দিয়েছি সহজে পারও হয়ে গেছি। গায়ে আমার দাগ লেগেছে কিন্তু মনে ছাপ লাগেনি। কিন্তু আমাকে আঁকড়ে ধরতে পারেনি।"[৬] তার নারীত্বকে প্রচলিত মূল্যবোধ ও সমাজনীতি দিয়ে বিচার করা যবে না। এ প্রসঙ্গে নীহাররঞ্জন রায়ের ব্যাখ্যায় পাওয়া যাবে এই চরিত্র অসামান্য হলেও কৃত্রিমতা কীভাবে তার মধ্যে গ্রন্থিত আছে শুধুমাত্র বর্তমানকে প্রতিফলিত কররার উদ্দেশ্যে, "তাহার চরিত্রের দুই দিক—একদিকে অবিচল আদর্শনিষ্ঠা, আর একদিকে সর্বপ্রকার সংস্কার বৈরহিত্য এমন কি প্রথাগত দেহ সংস্কার হইতেও মুক্তি—এ দুই দিকের একটা সুসমঞ্জস শিল্পরূপ লেখকের ভাবকল্পনার মধ্যে সঠিক গড়িয়া উঠিতে পারে নাই; তৎসত্ত্বেও একই চরিত্রে যে এই আপাতবিরোধী দিক পাশাপাশি বাস করিতে পারে এই চেতনা অনেকটা আধুনিক কালের বিজ্ঞানী মনের।"[৭]

সোহিনী রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য নায়িকাদের থেকে কোথায় ও কীভাবে আলাদা তার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে প্রমথনাথ বিশী বলেছেন, "প্রেয়সী পদের যোগ্যতম প্রতিনিধি যদি বিনোদিনী বা বাঁশরী হয়, জননীপদের যোগ্যতম প্রতিনিধি যদি রাসমণি বা আনন্দময়ী হয়, তবে নারীত্ব পদের যোগ্যতম ও একমাত্র প্রতিনিধি সোহিনী। অনিলা ও মৃণাল তাহার অস্পষ্ট পূর্বাভাস ও অযোগ্য পূর্বসূরী; বাংলা সাহিত্যে এই পথে এখন পর্যন্ত সোহিনীই প্রাগ্রসরতম পথিক। মনে হয় রবীন্দ্রনাথ নারী-সম্পন্ধীয় তাঁহার পূর্ববর্তী ধারণা হইতে কিঞ্চিৎ সরিয়া আসিয়াছেন। যাই হোক, সোহিনীকে বিচার করিতে হইবে প্রেয়সীরূপে নয়, জননীরূপে নয়,- নারীরূপে, অর্থাৎ ব্যক্তিরূপে।"[৮] নন্দকিশোরের প্রতি সোহিনীর আচরণ প্রেয়সী বা পত্নীসুলভ ছিল না, আবার নীলিমার প্রতি তার আচরণও মাতৃজনোচিত ছিল না। চিরাচরিত পত্নীরূপ, প্রেয়সীরূপ, বা জননীরূপ বাদ গেলে নারীচরিত্রে বাকি থাকে শুধু চরিত্রটুকু। সেই চরিত্র সম্পর্কে গল্পে বলা হয়েছে, "নন্দকিশোর দেখতে পেলেন মেয়েটির ভিতর থেকে ঝকঝক করছে ক্যারেকটারের তেজ, বোঝা গেল নিজের দাম ও নিজে জানে, তাতে একটুমাত্র সংশয় নেই।"[৯]

একখানি স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বপূর্ণ স্বাধীনচেতা আত্মপ্রত্যয়ী নারী চরিত্র শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ উপহার দিয়ে গেলেন বাঙালিকে, কিন্তু বাঙালি নারীর মধ্যে থেকে সেই সম্ভাবনা তিনি ফুটিয়ে তুললেন না। 'ইমানদার' হতে পারাই ছিল এই চরিত্রের সম্বল; পত্নী, প্রেমিকা, জননী, কন্যা এমন কিছু হয়ে ওঠার অতিরিক্ত কোনো দায়িত্ব সোহিনী পালন করেনি। তাই তার সমালোচনাও শুধুমাত্র চরিত্রের ক্ষেত্রে ছাড়া অন্যত্র হতে পারে না, এমনটাই মনে করেন প্রমথনাথ বিশী, "এই চরিত্রই তাহার ব্যক্তিত্ব, সংসারেও ইহাই তাহার একমাত্র নির্ভর ছিল; সমালোচনার ক্ষেত্রেও তাহাই একমাত্র নির্ভর হওয়া উচিত। চরিত্রের দার্ঢ্যের মূল্যেই তাহার মূল্য, অন্য মূল্যের আরোপ চলিবে না। রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রখর ব্যক্তিত্বশালিনী নারীর অভাব নাই, কিন্তু সর্বত্রই ব্যক্তিত্বের উপরে প্রেয়সীত্ব বা জননীত্বের আরোপ হইয়াছে। কিন্তু সোহিনীতে অন্যসংস্কারমুক্ত ব্যক্তিত্ব অর্থাৎ নির্গুণ নারীত্ব যেমন সমুজ্জ্বলভাবে প্রকট এমন আর কোথাও হয় নাই।"[১০] রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষ ছোটগল্পে যে 'নির্গুণ নারীত্ব'-এর নতুন সংজ্ঞা তৈরি করলেন, সেও এক অবাঙালি চরিত্রের ছায়ায়, বাঙালি নারী চরিত্ররা তার স্বাদ পেল না। বোধহয় রবীন্দ্রনাথের ভাবনা ছিল এত তেজোদীপ্তময়তা কোনো বাঙালি নারীর পক্ষে দেখানো সম্ভব হবে না, বরং তা অনেকক্ষেত্রে পশ্চিমা নারীদের ক্ষেত্রে মানায়। এখানে প্রমথনাথ বিশীর পর্যবেক্ষণ উল্লেখ্য, "রবীন্দ্রসাহিত্যে অসতী নারী কখনও উজ্জ্বলভাবে অঙ্কিত হয় নাই। কিন্তু সোহিনীতে প্রথম ব্যতিক্রম দেখা গেল। বোধ করি রবীন্দ্রনাথ বলিতে চান যে, সতীত্বের চেয়ে মনুষ্যত্ব পূর্ণোতর আদর্শ; কোনো নারী সতী না হইয়াও মনুষ্যত্বের ঐশ্বর্যে ভূষিত হইতে পারে; অন্তত সেই ঐশ্বর্যই সোহিনীর ভূষণ। তবু মনে রাখিতে হইবে যে, সোহিনী বাঙালী নয়, পাঞ্জাবী মেয়ে। শরৎচন্দ্রের শেষ প্রশ্নের কমল বাঙালী হইলেও লেখক অতি সন্তর্পণে তাঁহার সমাজবহির্ভূত এক খাপছাড়া পটভূমি সৃষ্টি করিয়াছেন।

সাধারণ বাঙালীঘরের মেয়ে লৌকিক অর্থে অসতী হইয়াও মনুষ্যত্বধনে ধন্য হইল—এরূপ অভিমত করিতে লেখকদের সংস্কার বাধাস্বরূপ হইয়াছে।"[১১] নারী কোনো বিশিষ্ট রূপে না দেখে তাকে একজন ব্যক্তিরূপে গড়ে তোলা—সোহিনী চরিত্র সৃষ্টির মাধ্যমে এই অসামান্য অবদানটি দিয়ে বাংলা সাহিত্যকে ঋদ্ধ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। সোহিনীর মাধ্যমে সতীত্ব ধারণার প্রচলিত আদর্শটিকে চূড়ান্ত আধুনিকতায় যাচাই করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এই চরিত্রের মাধ্যমে চিরাচরিত সতীত্বের ধারণাটিকে আধুনিকতার ছাঁদে সাকার করতে চেয়েছেন। তাঁর পক্ষে একদিকে অন্তরে আজন্মলালিত বিশ্বাসগুলিকে যেমন পুরোপুরি বিসর্জন দেওয়া সম্ভব হচ্ছিলো না, অন্যদিকে তিনি এটাও টের পেয়েছিলেন যে বর্তমান সময়কালটি কিন্তু অন্যকিছু দাবি করে। তাই সোহিনীর সতীধর্ম পালনের নিয়মকানুনও হয়ে গেল অভূতপূর্ব, "সে তাঁহার নিকটে আত্মসমর্পণ করিয়াছে প্রেমের আকর্ষণে নয়, জননী হইবার আকাঙ্ক্ষায় নয়। সোহিনীর ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছে, নন্দকিশোর ঠকে নাই; সোহিনী সমস্তপ্রকার নারীধর্ম বিসর্জন দিয়া কেবল কঠোর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে নন্দকিশোরের ল্যাবরেটরি রক্ষা করিয়াছে। ল্যাবরেটরি রক্ষার দ্বারাতেই সে তাহার অভিনব সতীধর্ম পালন করিয়াছে, প্রচলিত অর্থে ইহা কায়মনোবাক্যগত সতীত্ব নয়, ইহাকে বলিতে পারি নারীব্যক্তিত্বের সতীত্ব বা স্বধর্ম পালন।"[১২] সোহিনী সতীত্বের অন্য সংজ্ঞা রচনা করেছে যেখানে কথার দাম বড়, দায়িত্বপালন বড় অন্য সবকিছুর তুলনায়। তাও একজন বাঙালি মেয়েকে সেই ব্যক্তি হিসাবে গড়ে তোলা গেল না কেন, এই প্রশ্ন থেকে যায়। সেই অভাব হয়তো স্বয়ং রবীন্দ্রনাথেরও খেয়াল ছিল। তাই গল্পের মধ্যেই তার উত্তর পাওয়া যায় নানা জায়গায়। স্বামীর মৃত্যুর পর ল্যাবরেটরির সম্পত্তি ও অধিকার নিয়ে তাকে আইনি লড়াইয়ের সম্মুখীন হতে হয়। এই অবাঙালি চরিত্রটি অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে সব বাধা পেরিয়ে স্বামীর স্বপ্ন বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম হন, "সোহিনী স্বয়ং সমস্ত আইনের প্যাঁচ নিতে লাগল বুঝে। তাঁর উপরে নারীর মোহজাল বিস্তার করে দিলে স্থান বুঝে উকিলপাড়ায়। সেটাতে তাঁর অসংকোচ নৈপুণ্য ছিল, সংস্কার মানার কোনো বালাই ছিল না।"[১৩] মেয়ের বিয়ের প্রসঙ্গে সে ছিল গোঁড়ামি-মুক্ত-- "মেয়ের বিয়ের প্রসঙ্গে কুলশীল জাতগুষ্টির কথা বিচার করবার রাস্তা ছিল না। একমাত্র ছিল মন ভোলাবার পথ, শাস্ত্রকে ডিঙিয়ে গেল তাঁর ভেলকি।"[১৪] বিধবা হলেও বৈধব্যের নিয়মকানুন পালনের কোনো দায় তার ছিল না-- "আমার বয়সের বিধবা মেয়েরা ঠাকুরদেবতার দালালদের দালালি দিয়ে পরকালের দরজা ফাঁক করে নিতে চায়। আপনি শুনে হয়তো রাগ করবেন, আমি ও-সব কিছুই বিশ্বাস করি নে।"[১৫] এমনকি নিজের মেয়েও বেচাল করলে সে তার প্রাণ নিতেও পিছপা হবে না-- "নিজের কোমরবন্ধ থেকে ছুরি বের করে বললে, 'এ ছুরি না চেনে আমার মেয়েকে না চেনে আমার মেয়ের সোলিসিটরকে। এর স্মৃতি রইল তোমার জিম্মায়। ফিরে এসে যদি হিসেব নেবার সময় হয় তো হিসেব নেব।'"[১৬] নীলা যখন উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপনের জন্য ল্যাবরেটরির সম্পদ নষ্ট করতে উদ্যত হয়, তখন সোহিনী মমতার অন্ধত্বকে প্রশ্রয় দেয়নি। বরং রেবতীর সাথে নীলার বিয়ে ভেঙে দিয়ে ল্যাবরেটরিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে। বা বলা ভালো, তার সতীধর্মকে রক্ষা করে সে এভাবেই। এরকম অজস্রবার গল্পের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন যে সোহিনী বাঙালি হওয়ার দায় থেকে মুক্ত। সোহিনী অবাঙালি বলেই তাঁর পক্ষে এই শক্তিশালী ব্যক্তিত্বময়ীকে নির্মাণ করা সম্ভব হয়েছে। নয়তো বাঙালি নারীকে এই রূপে গড়তে গেলে তাঁকে হয়তো অনেক সমালোচনার সম্মুখীন হতে হত।

সোহিনীকে মূলত পাঞ্জাবি পরিবারের মেয়ে হিসাবে গড়ে তোলা হয়েছে। বাঙালি রক্ষণশীল সমাজ বা সংস্কারের গণ্ডি তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধতে পারেনি। কিন্তু এই রক্ষণশীলতা থেকে মুক্ত অবস্থায় তখনো হয়তো কোনো বাঙালি মেয়েকে চিত্রায়িত করা সম্ভব ছিল না। সোহিনী চরিত্র ফলে হয়ে গেছে তাঁর কাঙ্ক্ষিতভাবে গড়ে তোলা মানুষ। সোহিনীর চরিত্রে তিনি প্রথাগত বাঙালি বধূদের মতো কোমলতা বা পরনির্ভরশীলতার চেয়ে এক ধরনের তেজ,

বাস্তববুদ্ধি ও স্পষ্টবাদিতাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এই চরিত্রের মধ্য দিয়ে প্রথাগত সতীত্বের ধারণার ঊর্ধ্বে এক আধুনিক ও শক্তিশালী নারীরূপ ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি, যার শিকড় ছিল অবাঙালি সংস্কৃতির বাস্তবতায়। "ব্রতের মিলে আত্মার জোড় লেগে গিয়েছিল নন্দকিশোর আর সোহিনীতে। সে পাতিব্রাত্যের আদর্শ শরীরের কোনো সীমাতেই খুঁজে পাবার উপায় নেই। নন্দকিশোর সোহিনীকে 'যে-দশা থেকে নিয়ে এসেছিলেন সেটা খুব নির্মল নয়, এবং নিভৃত নয়।' তা নিয়ে কোনো মাথাব্যথা ছিল না তার মোটেই।"[১৭] ভূদেব চৌধুরীর পর্যবেক্ষণে স্পষ্ট যে, সোহিনীকে সোহিনী হিসাবে গড়ে তুলতে নন্দকিশোর নামের চরিত্রটিরও অনেক সমর্থন তাঁকে গল্পের প্রয়োজনে আনতে হয়েছে। সোহিনী কেন বাঙালি হল না তার মূলত দুটি সম্ভাবনা এই আলোচনা থেকে উঠে আসে। এক, লোকাচার-সংস্কারবিহীন প্রথাগত আবেগবর্জিত বাঙালি মেয়ের ধারণা তখনো ভাবা যায়নি; এবং দুই, সোহিনী চরিত্রের পরম দৃঢ়তা, এমনকি নিজের সন্তানের বুকে ছুরি বসিয়ে দেওয়ার মত মানসিক জোর সম্বলিত কোনো বাঙালি নারীচরিত্রকে কষ্টকল্পনা করতে হত। সেটি সমালোচনার ঊর্ধ্বে থাকতে পারত না, এবং এর ফলে রবীন্দ্রনাথের এই গল্পটি রচনার আসল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যেত। কিন্তু সোহিনী অবাঙালি বলেই হয়তো, এই গল্পটিকে এখনো অবধি এই কারণে কোনও তীব্র সমালোচনার মুখে পড়তে হয়নি।

সোহিনী পশ্চিম দেশের পাঞ্জাবী বংশোদ্ভূত বলেই একমাত্র এই গল্পটি রবীন্দ্রনাথের পক্ষে রচনা করা সম্ভব হয়েছে—এ কথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। রবীন্দ্রসাহিত্যে নানা প্রকার তেজোদীপ্ত নারীচরিত্রের সমাবেশ দেখা যায়। 'গোরা' উপন্যাসের সুচরিতা, অথবা ললিতা, 'নষ্টনীড়'-এর চারুলতা, 'চোখের বালি'র বিনোদিনী, 'স্ত্রীরপত্র'-এর মৃণালিনী প্রত্যেকে নিজস্ব স্বকীয়তায় উদ্ভাসিত। তাদের প্রত্যেকের নারী ধর্ম আলাদা করে চোখে পড়ার মত; কেউ কারোর প্রতিদ্বন্দ্বিনী নয়, সবাই নিজস্ব আদর্শে সমুজ্জ্বল। কিন্তু সোহিনীর মত ব্যক্তিত্বময়ী এরা কেউ নয়; তার পরিণামদর্শিতা, বিবেচনাবোধ, কূটনৈতিক বুদ্ধি, দূরদর্শিতা অনেকক্ষেত্রে এতটাই পুরুষালি যে কখনও কখনও তাকে আলাদা করে নারী বলে মনে হয় না। নারীত্বকে ছাপিয়ে যায় যে নারী, সেই নারীকে বাঙালি পরিচয়ে গড়ে তোলা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সম্ভব হয়নি। নারীত্বের সব প্রচলিত সংজ্ঞাকে যে অর্থহীন করে দিতে পারে; লোকাচারকে, আদর্শকে, সংস্কারকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে যে নিজের প্রবল নারীধর্মের ধ্বজা উত্তোলন করতে পারে, এমন নারীকে বাঙালি করে তুলতে পারেননি রবীন্দ্রনাথ। প্রায় একইরকম ব্যঞ্জনা 'গোরা' উপন্যাসে আইরিশ বংশোদ্ভূত গোরা ও বাঙালি হারানবাবুর চরিত্রের পাশাপাশি তুলনায় উঠে আসে। ভারতীয় সংস্কৃতির পক্ষে যে পুরুষোচিত বলশালী কণ্ঠস্বর গোরার পক্ষে রাখা সম্ভব হচ্ছে, ভারতীয় ও বাঙালি হয়েও হারানবাবুর পক্ষে সেই দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হচ্ছে না। বাঙালিদের পক্ষে আবেগবর্জিত, মস্তিস্ক-পরিচালিত শক্তিশালী চরিত্র গড়ে তোলা যায় না বলেই বোধহয় তিনি মনে করতেন। সেই রাবীন্দ্রিক চেতনার ফলাফল বলেই মনে করা যায় সোহিনীকে।

Reference:

১। শ্রীভূদেব চৌধুরী, *বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার*, মডার্ণ বুক এজেন্সী, কলকাতা, ১৯৬০, পৃ. ৮২০
২। নীহাররঞ্জন রায়, *রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা*, দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, দি বুক এম্পোরিয়ম লিমিটেড, ১৩৫১ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২৬২
৩। শ্রীভূদেব চৌধুরী, *বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার*, মডার্ণ বুক এজেন্সী, কলকাতা, ১৯৬০ পৃ. ৮১৯
৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "ল্যাবরেটরি", *তিন সঙ্গী*, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৫০

বঙ্গাব্দ, পৃ. ৮৬

৫। শ্রীভূদেব চৌধুরী, *বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার*, মডার্ণ বুক এজেন্সী, কলকাতা, ১৯৬০ পৃ. ৮২০-৮২১

৬। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "ল্যাবরেটরি", *তিন সঙ্গী*, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৫০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৮৫

৭। নীহাররঞ্জন রায়, *রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা*, দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, দি বুক এম্পোরিয়ম লিমিটেড, ১৩৫১ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২৬১

৮। শ্রীপ্রমথনাথ বিশী, "তিন সঙ্গী", *রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প*, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৩৬১ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১১৪

৯। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "ল্যাবরেটরি", *তিন সঙ্গী*, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৫০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৭৩

১০। শ্রীপ্রমথনাথ বিশী, "তিন সঙ্গী", *রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প*, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৩৬১ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১১৫

১১। ঐ, পৃ. ১১৭

১২। ঐ, পৃ. ১১৬

১৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "ল্যাবরেটরি", *তিন সঙ্গী*, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৫০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৭৪

১৪। ঐ, পৃ. ৭৪

১৫। ঐ, পৃ. ৭৭

১৬। ঐ, পৃ. ১১১

১৭। শ্রীভূদেব চৌধুরী, *বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার*, মডার্ণ বুক এজেন্সী, কলকাতা, ১৯৬০ পৃ. ৮১৯-৮২০

Bibliography:

১। আইয়ুব, আবু সয়ীদ। *আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ*, দ্বিতীয় সংস্করণ, ভারবি, কলকাতা, ১৯৫৬

২। ঘোষ, তপোব্রত। *রবীন্দ্র-ছোটগল্পের শিল্পরূপ*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১০

৩। চক্রবর্তী, ইন্দ্রাণী। *বাংলা ছোট গল্প রীতি-প্রকরণ ও নিবিড় পাঠ*, রত্নাবলী, কলকাতা, ১৯৯৯

৪। চৌধুরী, শ্রীভূদেব। *বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার*, মডার্ণ বুক এজেন্সী, কলকাতা, ১৯৬০

৫। বন্দোপাধ্যায়, শ্রীকুমার। *রবীন্দ্র-সৃষ্টি-সমীক্ষা*, দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ

৬। বসু, বুদ্ধদেব। *রবীন্দ্রনাথ : কথাসাহিত্য*, তৃতীয় সংস্করণ, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ

৭। বিশী, শ্রীপ্রমথনাথ। *রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প*, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৩৬১ বঙ্গাব্দ

৮। মিত্র, হরপ্রসাদ। *রবীন্দ্র-সাহিত্য-পাঠ*, প্রথম খণ্ড, ডি এম লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ

৯। রায়, নীহাররঞ্জন। *রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা*, দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, দি বুক এম্পোরিয়ম লিমিটেড

১০। হালদার, গোপাল। *রবীন্দ্রনাথ : শতবার্ষিকী প্রবন্ধ-সংকলন*, ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

CC BY NC